হযরত
আবূ হুরায়রা
রা.
মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী

প্রকাশকের কথা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ছিলেন এক বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। ইসলামের শুরুতে যেসব সাহাবী তাঁদের ত্যাগ, নিষ্ঠা ও সেবার মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে অবদান রেখেছেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। তাঁর জ্ঞান-পিপাসা ও অসাধারণ স্মরণশক্তির কারণে স্বয়ং রাসূল (সা) তাঁকে 'ইলমের ভাণ্ডার' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ছিলেন সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তিনি ছিলেন রাসূল (সা)-এর প্রায় সার্বক্ষণিক সঙ্গী, দরিদ্র অথচ কারো কাছ থেকে ভিক্ষা প্রত্যাশী নন। দারিদ্র ও ক্ষুধার নিষ্ঠুর পরিস্থিতির মধ্যেও তিনি অতুলনীয় ধৈর্য ও সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত সম্মানিত সাহাবী ও হাদীস বর্ণনাকারী আবূ হুরায়রা (রা) বাস্তব জীবনের খ্যাতি-সম্মান-প্রতিপত্তির কথা কোন দিন ভাবেননি। তিনি ছিলেন ইলম ও হিকমতের একনিষ্ঠ সাধক ও গবেষক।

ইসলামের ইতিহাসে এই মহতী মানুষকে নিয়ে সংক্ষিপ্ত এ গ্রন্থটি লিখেছেন প্রখ্যাত আলেম, ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক ও গবেষক মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী। অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে রাসূল (সা)-এর অতিপ্রিয় ও আস্থাভাজন এই সাহাবীর জীবনী তিনি রচনা করেছেন। ১৯৮০ সালে এ গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় এবং এরপর আরো ৩ দফা পুনর্মুদ্রিত হয়। এ থেকে এ গ্রন্থটির পাঠকপ্রিয়তা লাভের ধারণা মেলে। বর্তমানে এ গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। আশা করি পূর্বের মতোই বইটি পাঠকদের কাছে জনপ্রিয় হবে।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

লেখকের কথা

সাহাবায়ে কিরাম (রা)–এর জীবন আকাশের নক্ষত্ররাজির মতো উজ্জ্বল ও মহিমান্বিত। প্রত্যেকেই হিদায়তের পথে অনুসরণযোগ্য। বিশ্বনবী (সা)–র সংস্পর্শ লাভে তাঁরা ধন্য হয়েছিলেন, হয়েছিলেন বিশ্ববাসীর জন্যে এক মহান আদর্শ ও বরেণ্য। তাঁদের অক্লান্ত সাধনার ফলে সনাতন ধর্ম ইসলামের জ্যোতিচ্ছটা দিকবিদিক বিচ্ছুরিত হয়েছে। আল–কুরআন ও হাদীসে রসূল আজ অবিকৃত অবস্থায় আমাদের মধ্যে বিরাজমান।

সাহাবায়ে কিরাম (রা) মানব সমাজের জন্যে সভ্যতার এক নতুন দিগন্ত রূপরেখা নির্ণয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ইসলামের সেবায় তাঁদের ত্যাগ–তিতিক্ষার ইতিহাস সত্যই অতুলনীয়। কুরআন ও হাদীসের যথাযথ হিফাজত ও উভয়ের প্রকৃত তত্ত্ব ও তথ্য অনুধাবনের নিমিত্ত তাঁদেরকে দেয়া হয়েছিল অসাধারণ ধী–শক্তি ও পর্যাপ্ত জ্ঞানভাণ্ডার।

সাহাবায়ে কিরাম (রা)–এর অনেকেই কুরআন পাকের বড় বড় সূরা নামাযে ইমামের মুখ থেকে শুনে কণ্ঠস্থ করে নিতেন। তাঁদের জ্ঞান ছিল অপরিসীম, হৃদয় ছিল কোমল, কিন্তু আল্লাহ্‌র দুশমন ও বিদ্রোহীদের জন্যে তাঁরা ছিলেন একান্তভাবে কঠোর, তাঁরা ছিলেন ইল্‌ম ও হিক্‌মতের একনিষ্ঠ সাধক ও গবেষক। তাঁদের ইল্‌ম ও হিকমত ছিল বাস্তবমুখী কল্যাণকর; মঙ্গলের সাথে সম্পর্কিত। অনাবশ্যক, অকল্যাণকর জ্ঞানের রাজ্যে অনর্থক সময় নষ্ট করাকে তাঁরা আদৌ পছন্দ করেন নি। যে ইল্‌ম আল্লাহ্‌র আনুগত্য শিক্ষা দেয় না, যে জ্ঞান আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রেম–প্রীতির প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে না, যে জ্ঞান মানব সমাজে মানবতার পরিবর্তে স্বার্থপরতা ও স্বেচ্ছাচারিতার জন্ম দেয়, তথাকথিত সমাজে সেরূপ ইল্‌ম ও হিকমতের যা–ই নামকরণ করা হোক না কেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সেসব জাহিলিয়াতেরই অপর নাম। সাহাবায়ে কিরাম (রা) এ ধরনের জ্ঞান ও জ্ঞানীর প্রতি ঘৃণাই পোষণ করতেন। হযরত রসূলে আকরাম (সা) ছিলেন যাবতীয় সৎ ও মহৎ গুণাবলীর আধার। সাহাবীদের কারো কারো উপর হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা)–র বিশেষ গুণের ছাপ পরিলক্ষিত হতো। কেউ অতিমাত্রায় ইবাদত করতেন, কেউ আবার দান–খয়রাত করে জীবনকে সার্থক করতেন, কারুর মধ্যে শাসন পরিচালনার দক্ষতা এবং কারুর মধ্যে নম্রতা, লজ্জাশীলতার বিকাশ ঘটতো। আবার কেউ হতেন সংসারের মোহমুক্ত, কেউ জ্ঞানপিপাসু, কেউ বা রাজনীতিবিদ।

হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা)–র প্রতি মহব্বত, হাদীসের জ্ঞান আহরণ ও তার প্রচারই ছিল হযরত আবূ হুরায়রা (রা)–র জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ সাধনায় তিনি সফলতাও অর্জন করেছিলেন যথেষ্ট। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যাধিক্যই তাঁর সফলতার প্রকৃত প্রমাণ। এ জ্ঞানপিপাসু সাহাবীর জীবনী লেখার কাজে মনোনিবেশ করেছিলাম আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর পূর্বে। পুস্তকটির প্রয়োজনীয় উপকরণ সে সময়েই সংগৃহীত হয়েছিল। কিন্তু নানা কারণে পুস্তকটি প্রকাশ করার সুযোগ ঘটেনি। পুস্তকটি লিখতে কতগুলো প্রামাণ্য কিতাবের সাহায্য নিয়েছি। এতে রয়েছে (১) মাওলানা আবদুল কুদ্দুস হাশেমী লিখিত "দারসে গাহে রাসূলকে দু'তালিব এ-ইল্‌ম" (২) মাওলানা সৈয়দ আহমদ আকবরাবাদী প্রণীত "ফাহ মে কুরআন" (৩) "মুহাজিরীন" (৪) "মিশকাত শরীফ" প্রভৃতি। কিতাব সংগ্রহ ও উপযুক্ত অনুসন্ধানের অভাবে আরও অধিক তথ্যাদি পরিবেশন করা হয়ত আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করতে আমি কোন প্রকার ক্রুটি করিনি। অবশ্য চেষ্টার সফলতা ও সার্থকতা নির্ভর করছে আল্লাহ্ পাকের রহমতের উপর। পুস্তকটিতে ভুলক্রুটি পরিলক্ষিত হলে সুধিগণ তা ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখবেন এবং এ বিষয়ে অবহিত করে কৃতার্থ করবেন।

মুহম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী

সূচী

হযরত আবূ হুরায়রা (রা)

নাম ও বংশ-পরিচয়

মুসলমান হওয়ার পূর্বে তাঁর নাম ছিল 'আবদে শাম্‌স' (সূর্যের দাস)। ইসলাম গ্রহণের পর রসূলে আকরাম (সা) তাঁর নাম বদলিয়ে রাখেন আবদুর রহমান--যার অর্থ 'রহমানের বান্দা'। কিন্তু আবূ হুরায়রা অর্থাৎ বিড়ালের বাবা নামটিই প্রসিদ্ধি লাভ করলো অধিক। তাঁর এ নামটির একটি ইতিহাস রয়েছে, যা তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমার একটি ছোট্ট বিড়াল ছিল। আমি যখন ছাগল চরাতে যেতাম তখন বিড়ালটিকেও সাথে করে নিয়ে যেতাম। রাতে তাকে গাছের কোটরে রেখে দিতাম, অবসর সময় তাকে নিয়ে খেলতাম। বিড়ালের সাথে আমার এ সম্প্রীতি দেখে লোকেরা আমাকে 'আবূ হুরায়রা' নামে ডাকতে আরম্ভ করলো এবং ক্রমশ এ নামটিই প্রসিদ্ধি লাভ করলো। আবূ হুরায়রা ছিলেন 'দাউস' বংশের লোক। এ গোত্রটির আবাস ছিল ইয়েমেন। তার দেহের বর্ণ ছিল গোধুম বর্ণের ঈষৎ উজ্জ্বল, দু'স্কন্ধের মধ্যবর্তী স্থান ছিল একটু প্রশস্ত, সম্মুখস্থ দাঁতগুলোর মাঝখানে কিছুটা ফাঁক ছিল, চুল ছিল লম্বা।

শৈশবকাল

তিনি শৈশবেই তাঁর পিতাকে হারান। জীবিকার অন্বেষণে বাধ্য হয়ে তিনি জনৈক মহিলার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। পরে উক্ত মহিলার সাথেই তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। মহিলার নাম বোচ্‌রা বিনতে গাযওয়ান।

স্বভাব

আল্লাহ্‌তা'আলা এবং প্রিয় রসূল (সা)-এর পছন্দনীয় যাবতীয় গুণ তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) খুব নম্র স্বভাবের ছিলেন। তিনি ছিলেন সুশ্রী।

দীন ইসলাম গ্রহণ

হিজ্‌রী সাত সন, খায়বর যুদ্ধ বিজয়ের পর হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ইয়েমেনের আশিজন লোক সঙ্গে নিয়ে রসূলে আকরাম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হন। হযরত রসূলুল্লাহ্‌ (সা) তখন খায়বর-এ অবস্থান করছিলেন জানতে পেরে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) খায়বর অভিমুখে রওনা হলেন এবং সেখানে পৌঁছে সকলেই মুসলমান

হয়ে গেলেন। তাঁর এক দাসও এ সফরের সাথী ছিল। ঘটনাচক্রে সে পথ হারিয়ে ফেললো। তিনি সদলবলে রসূলে আকরাম (সা)–এর খিদমতে পৌছার কিছুক্ষণ পর আল্লাহ্‌র রহমতে তাঁর দাসও এসে পৌছলো। তাকে দূরে আসতে দেখে রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করলেন ঃ ঐ দেখ আবূ হুরায়রা! তোমার দাস আসছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) আনন্দিত হয়ে তাকে দাসত্বের বন্ধন হতে চিরমুক্ত করে দিলেন।

তিনি ইসলাম প্রচারের জন্যে বিরামহীন চেষ্টা চালিয়ে যান। তাঁর প্রচেষ্টায় 'দাউস' গোত্রের বহুলোক মুসলমান হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র জননীর ইসলাম গ্রহণ

মাতাকে কিভাবে ইসলামের দৌলতে পুণ্যবান করা যায়–এখন হযরত আবূ হুরায়রা (রা)–র মাথায় এক নতুন চিন্তা, নতুন ভাবনা–কিভাবে তাঁর নিকট দাওয়াত পেশ করা যায়, তিনি কী–ই বা বলে বসেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা)–র মস্তিষ্কে এসব হিসাব–নিকাশ ঘুরপাক খাচ্ছে।

এক সময় সাহস করে তিনি মার কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করে বসলেন। আর কি! মা তো ভীষণ চটে গেলেন। মায়ের রাগ থামলে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) তাকে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা)–র সম্পর্কে বললেন। ইসলাম কি ও কেন, তাও বুঝালেন। কিন্তু মা কিছুতেই বুঝলেন না। অগত্যা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)–র দরবারে গিয়ে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! দোয়া করুন আমার জননীকে––আল্লাহ্ যেন তাওফীক দেন, ইসলামের আলোকে তাঁর হৃদয় যেন আলোকিত হয়ে উঠে।"

হযরত রসূলে আকরাম (সা) দু'হাত তুলে আবূ হুরায়রা (রা)–র মাতার জন্যে আল্লাহ্‌র দরবারে মুনাজাত করলেন। রসূলুল্লাহ্‌র দোয়া বিফলে যায় নি। আবূ হুরায়রা (রা) ঘরে প্রত্যাবর্তন করে মাতার অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন। ইসলামের মহব্বত তাঁর হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। তিনি ঘরের দরজার কড়া নাড়তেই জননী বললেন, "আবূ হুরায়রা! এসো!" অতঃপর তিনি ঘরে প্রবেশ করামাত্র তাঁর জননী বলে উঠলেন ঃ "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।" মায়ের মুখে অমন পবিত্র বাক্য শুনে আবূ হুরায়রা (রা)–র আনন্দ আর কে দেখে! বহুদিনের আশা আজ সফল হলো। উল্লসিত মনে তৎক্ষণাৎ তিনি হযরত রসূলে আকরাম (সা)–এর খিদমতে উপস্থিত হলেন এবং আরয করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি দোয়া করুন মুসলমানগণ যেন আমার ও আমার মাতার প্রতি সদয় হয় এবং আমরাও যেন মুসলমানদের প্রতি মহব্বত পোষণ করি।" রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ও তাঁর মাতার জন্যে দোয়া করলেন।

হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সুখে-দুঃখে, অনাহারে-অর্ধাহারে সারাক্ষণ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কদম মুবারকে পড়ে থাকতে পারলেই গৌরব বোধ করতেন। তিনি যেদিন হতে রসূলে আকরাম (সা)-এর সান্নিধ্যে আসেন, সেদিন থেকে জ্ঞান আহরণে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। অন্য কোন সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে রসূলুলাহ্ (সা)-র সান্নিধ্য হতে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে তিনি আদৌ পছন্দ করেন নি। একটানা চার বছর কাল তিনি প্রিয় নবী (সা)-র খিদমতে থাকার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

জীবনের করুণ স্মৃতি

হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মহব্বতে ও ইসলামের খাতিরে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বহু দুঃখ ও গ্লানি সহ্য করেছেন--বরণ করে নিয়েছেন অভাব-অনটন ও দুর্যোগকে। হযরত ইবনে সিরীন (রা) বর্ণনা করেন ঃ আমরা এক সময় হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র খিদমতে উপস্থিত হই। তখন তিনি কিতানের রুমাল দ্বারা নাক সাফ করছিলেন এবং বলছিলেন, "কি আশ্চর্য! আজ আমি কিতানের রুমাল দ্বারা নাক সাফ করছি, অথচ আমার জীবনে এমন মুহূর্তও অতিক্রান্ত হয়েছে যে, হযরত রসূলে আকরাম (সা)-এর মিম্বর শরীফ ও হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-র হুজরার মধ্যবর্তী স্থানটুকু অতিক্রম করতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তাম, লোকজন আমাকে মৃগী রোগাক্রান্ত মনে করে আমার গর্দানে পা দিয়ে চেপে ধরতো, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি মৃগী আক্রান্ত বা পাগল কোনটাই ছিলাম না। ক্ষুধার তাড়নায় মাটিতে লুটিয়ে পড়তাম।" বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, "আমি খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর ফারুক (রা)-এর নিকট কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি তার উত্তর দিলেন। আমি অল্প কিছুদূর অগ্রসর হয়ে ক্ষুধায় মুষড়ে পড়লাম। অতঃপর আমার শিয়রে হযরত রসূলে আকরাম (সা)-কে দেখতে পেলাম।"

তিনি বলেন, "আমি ক্ষুধার্ত অবস্থায় অনেকবার রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে পথ চলতাম। মনে আশা থাকতো যে, প্রিয় নবী (সা) আমাকে আহার্য দান করবেন; আমার ক্ষুধা নিবারণ করবেন। ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কোন সাহাবীর নিকট কুরআনের কোন আয়াত সম্পর্কে এ জন্যে প্রশ্ন করতাম যে, তিনি আকার-ইঙ্গিতে আমার অবস্থা অনুভব করে আমাকে যেন কিছু খেতে দেন।" তিনি আরও বলেন, "আমি হযরত জাফর (রা)-এর নিকট যখন কোন প্রশ্ন করতাম, তিনি আমাকে প্রথমে তাঁর গৃহে নিয়ে যেতেন এবং ঘরে যা কিছু মজুদ থাকতো তা হতে কিছু খেতে

দিতেন। আহার করে তৃপ্তি লাভ করার পর তিনি আমার প্রশ্নের উত্তর দান করতেন।” তিনি মিসকীনদের অধিক স্নেহ করতেন বলেই হযরত রসূলে আকরাম (সা) তাঁকে ‘আবুল মাসাকীন’ (মিসকীনদের পিতা) বলে সম্বোধন করতেন। তিনি বলেন ঃ “আমার জীবনে এরূপ সময়ও অতিবাহিত হয়েছে যে, আমি একাধারে তিন দিন যাবত অনাহারে রয়েছি। তখন হাঁটতে গেলে মনে হতো যেন হঠাৎ মাটিতে পড়ে যাব। বালকেরা আমার এ অবস্থা দেখে বলতো যে, আবূ হুরায়রাকে জিনে পেয়েছে।” এসব করুণ বৃত্তান্ত পাঠ করলে সহজে অনুমান করা যায় যে, তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিলো পরকালের মঙ্গল ও হযরত রসূলে আকরাম (সা)–এর পবিত্র সান্নিধ্য। সকল আনন্দকে বিসর্জন দিয়ে এই এক আনন্দেই বিভোর ছিলেন। সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রসূল (সা)–এর সঙ্গেই সম্পর্ক জুড়েছিলেন। তাঁর অবস্থা ছিল এই ঃ

প্রেম যখন করেছি তখন লজ্জা কিসের
দুঃখ–দৈন্যে আমার আবার চিন্তা কিসের।
হাসুক জগত ভয় নেই–
শান্তি না পাই ভয় নেই।

জ্ঞান অর্জনের সাধনা

জ্ঞান আহরণই ছিল হযরত আবূ হুরায়রা (রা)–র জীবনের অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্য হাসিলের পথে তিনি যে কোন ত্যাগের জন্যে প্রস্তুত থাকতেন। ধন–সম্পদ, সন্তান–সন্ততি, ভাল খাবার, ভাল পোশাক, উত্তম আবাস ইত্যাদির প্রতি তাঁর কোন মোহই ছিল না। তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে সর্বদা এ প্রার্থনাই করতেন, “হে প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করো। আমাকে তোমার ও তোমার প্রিয় নবীর খাঁটি আশেক করে নাও।” তিনি জ্ঞানের সন্ধানে নিজেকে ব্যাপ্ত রাখতেন এবং কোন বিষয়ে জানার প্রয়োজন হলে অকুতোভয়ে হযরত রসূলে আকরাম (সা)–এর নিকট প্রশ্ন করে জেনে নিতেন।

হযরত যায়দ বিন সাবিত (রা) বর্ণনা করেন––“আমি, হযরত আবূ হুরায়রা ও আমার একজন সাথী––এই তিনজন মসজিদে আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও দোয়ায় মশগুল ছিলাম। এমন সময় হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা) তশরীফ আনলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা)–কে দেখে আমরা নীরবতা অবলম্বন করলাম। আমাদের নীরবতা দেখে রসূলে আকরাম (সা) পূর্বের মতো যিক্‌র ও দোয়ার পবিত্র কাজে মশগুল থাকতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর আমি ও আমার সাথী আল্লাহ্‌র দরবারে মুনাজাত করতে লাগলাম। হযরত

আমাদের দোয়া শেষ হলো। অতঃপর হযরত আবূ হুরায়রা (রা) দোয়ার জন্যে হাত উত্তোলিত করলেন এবং বলতে লাগলেন ঃ "হে আল্লাহ্! আমার দোয়ার পূর্বে তোমার বান্দারা তোমার নিকট যা চেয়েছে আমাকেও সে সব দান করো। তোমার কৃপায় আমাকে এরূপ জ্ঞান দান করো, যা আমি কখনো না ভুলি।" হযরত রসূলে আকরাম (সা) এ দোয়ার সাথেও 'আমীন' 'আমীন' ইরশাদ করলেন। আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট অনুনয় করলাম, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি আল্লাহ্র দরবারে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যেও অনুরূপ দোয়া করুন।" রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করলেন, "এ দোয়া এখন দাউস গোত্রের এ যুবকের (আবূ হুরায়রা) প্রাপ্য হয়ে গেছে।"

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) একবার তাঁর স্মরণশক্তি বৃদ্ধির জন্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট দোয়া প্রার্থী হলেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা) মাটিতে তাঁর চাদর বিছিয়ে দেয়ার জন্যে নির্দেশ দিলেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) তাঁর চাদর পেতে দিলেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা) পবিত্র হাত চাদরের উপর বুলিয়ে দিলেন এবং চাদরখানা গুছিয়ে সিনায় লাগাবার জন্যে হুকুম করলেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আদেশ অনুযায়ী হযরত আবূ হুরায়রা (রা) চাদরখানা তুলে বক্ষদেশে স্থাপন করলেন। আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন ঃ এ আমলের পর আমি অসাধারণ স্মরণশক্তির অধিকারী হই! আল্লাহ্ আমার হৃদয়কে প্রশস্ত ও দৃঢ় করে দিয়েছেন। এরপর আমি কোন কথা ভুলিনি।

অসাধারণ স্মরণশক্তি

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) স্বভাবতই জ্ঞান-পিপাসু ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দোয়া প্রাপ্তির পর তাঁর স্মরণশক্তি অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। তিনি বলেন ঃ "যে কথা একবার আমার শ্রুতিগোচর হতো, তা আর কখনও ভুলতাম না। তাঁর স্মরণশক্তির পরীক্ষা-নিরীক্ষাও কম হয়নি। একবার মারওয়ান তাঁর শাহী আসনের নিচে কাতিবকে (মীর মুন্‌শী) লুকিয়ে রেখে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-কে দরবারে ডেকে পাঠালেন। তিনি আসার পর তাঁর নিকট হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) যখন হাদীস বর্ণনা আরম্ভ করলেন, তখন কাতিব তা হুবহু লিপিবদ্ধ করলেন। লিপিবদ্ধ হাদীসগুলো যত্নসহকারে রেখে দেওয়া হলো। এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর পুনরায় যখন হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-কে হাদীস বর্ণনার অনুরোধ করা হলো, তখন তিনি সেই সমুদয় হাদীস হুবহু বর্ণনা করলেন। এ বর্ণনাতে বিন্দুমাত্র তফাত ও গরমিল পরিলক্ষিত হয়নি। স্মরণশক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখতেন এবং পরবর্তী সময়ে লেখা অনুযায়ী হাদীস বর্ণনা

করতেন এবং হাদীস বর্ণনায় খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতেন। এ প্রসঙ্গে এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। হাসানের পুত্র ফজল তাঁর পিতা আমরের পুত্র হাসানের একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ "আমার পিতা হাসান হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে একটি হাদীস শুনেছিলেন। বেশ কিছুদিন পর তিনি উক্ত হাদীস হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র নিকট বয়ান করলেন এবং বললেন ঃ আমি এ হাদীসটি আপনার থেকেই শুনেছি। উত্তরে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বললেন ঃ যদি আমি এ হাদীস বর্ণনা করে থাকি তাহলে নিশ্চয়ই এ হাদীস আমার কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।"

অতঃপর হাসানকে সাথে করে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) তাঁর বাস ভবনে গেলেন। তিনি কিতাব নিয়ে এলেন এবং তা খুলে দেখেন ঠিকই হাদীসটি লিপিবদ্ধ আছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হাসানকে বললেন ঃ "আমি বলেছিলাম, যদি এ হাদীস আমি বর্ণনা করে থাকি তাহলে নিশ্চয় তা আমার কিতাবে লেখা থাকবে। এখন দেখুন, আমার দাবী সত্য প্রমাণিত হলো তো!"

উক্ত ঘটনা হতে আমরা অনুমান করতে পারি যে, তিনি হাদীস বর্ণনায় খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতেন এবং উত্তমরূপে যাচাই ও তাহকীক না করে কোন হাদীস তিনি গ্রহণ বা বর্জন করতেন না।

ইল্‌ম প্রচারে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি নানা বাধা-বিপত্তি ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে 'ইল্‌ম-এ-দীন হাসিল এবং উক্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার দ্বারা সাধারণের উপকার সাধনের জন্যেও কঠোর পরিশ্রম করেছেন। তিনি জনসাধারণের মধ্যে হাদীসে রসূল প্রচারের জন্যে সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। প্রতি সপ্তাহে জুম'আর নামাযের পূর্বে তিনি নিয়মিত হাদীস বয়ান করতেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হয় এবং 'ইল্‌ম থাকা সত্ত্বেও যদি সে তা গোপন করে, তাকে রোজ কিয়ামতে অগ্নির লাগাম পরানো হবে।" এ কারণেই তিনি সকলের নিকট হাদীস প্রচারের জন্যে ব্যাকুল থাকতেন এবং অদম্য চেষ্টা চালাতেন। একদিনের ঘটনা ঃ তিনি বাজারে উপস্থিত হলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগলেন, হে লোক সকল! মসজিদে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দৌলত বন্টন হচ্ছে। উক্ত ঘোষণা শুনে সবাই মসজিদের দিকে দৌড়ে গেলেন। গিয়ে দেখলেন সেখানে দৌলতের কিছু নেই, তবে মসজিদে কিছু লোক দেখা গেল। তারা কেউ নামাযে রত, কেউ কুরআন শরীফ

তিলাওয়াতে মশগুল। কেউ হালাল–হারাম ইত্যাদি মাসলা–মাসায়েলের আলোচনায় ব্যস্ত। তাঁরা ফিরে এসে বললেন, "কই, আমরা মসজিদে কোন দৌলত বন্টন হওয়ার ব্যাপার তো দেখলাম না। শুধু কিছুসংখ্যাক লোককে জ্ঞানচর্চা ও ধর্মকর্মে লিপ্ত দেখতে পেলাম। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) উত্তরে বললেন, "তোমাদের বুদ্ধির স্থূলতা দেখে আমি আশ্চর্যবোধ করছি। 'ইবাদত ও ইল্‌ম এ সবইতো হযরত রসূলে আকরাম (সা)–এর সম্পত্তি ও আমানত। আর তিনি তা রেখে গেছেন তাঁর উম্মতেরই জন্যে।"

একবার হযরত আবূ হুরায়রা (রা) রোগাক্রান্ত হলেন। অনেক গণ্যমান্য লোক তাঁকে দেখতে এলেন, সমস্ত ঘর লোকে পরিপূর্ণ। তিনি তাঁদের সম্মানার্থে পা গুটিয়ে নিলেন এবং বললেন, "আমরা একবার রসূলুল্লাহ্ (সা)–র খিদমতে গেলাম। তিনি আমাদের কারণে পবিত্র পা দু'টো গুটিয়ে নিলেন এবং ইরশাদ করলেন, "তোমাদের নিকট দূর–দূরান্ত থেকে ইল্‌ম শিক্ষার জন্যে লোকজন আসবেন। তখন তোমরা তাদেরকে ধন্যবাদ জানাবে। সদ্ব্যবহার করে উত্তমরূপে 'ইল্‌ম শিক্ষা দেবে।"

'ইল্‌ম-এ-হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র স্থান

হযরত রসূলে আকরাম (সা) হযরত আবূ হুরায়রা (সা)–র বিষয়ে ইরশাদ করেছেন ঃ "আবূ হুরায়রা 'ইল্‌মের ভান্ডার।" একবার হযরত আবূ হুরায়রা (রা) রসূলে আকরাম (সা)–এর নিকট প্রশ্ন করলেন, "কিয়ামত দিবসে কোন্ ভাগ্যবান ব্যক্তি আপনার সুপারিশের অধিকারী হবেন?" রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করলেন, "হাদীস শিক্ষার বিষয়ে তোমার উৎসাহ দৃষ্টে আমি পূর্বেই এ ধারণা করছিলাম যে, তুমি ব্যতীত অন্য কেউ এরূপ প্রশ্ন করার গৌরব অর্জন করবে না। অতঃপর বললেন ঃ "যে ব্যক্তি খালেস অন্তরে 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে সে–ই কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশের হকদার হবে।" হযরত উমর (রা)–এর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রা) একজন শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ঃ "আবূ হুরায়রা আমাদের মধ্যে হাদীসের একজন অন্যতম বিশারদ।" হাফেজ জাহাবী ছিলেন হাদীস বর্ণনাকারীদের একজন শ্রেষ্ঠ নাফিস (নিরীক্ষাকারী)। তিনি বলেন যে, আবূ হুরায়রা 'ইল্‌মের পাত্র এবং ফতোয়া দেওয়ার উপযুক্ত ইমামগণের অন্যতম। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হাফিজ ইবনে হাজর (র) বলেন ঃ আবূ হুরায়রা (রা) তাঁর সমসাময়িক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে অন্যতম হাফিজে হাদীস ছিলেন। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে তাঁর মতো এত অধিক সংখ্যক হাদীস আর কেউ

সংগ্রহ করতে পারেন নি। ইমাম শাফীঈ (র) বলেছেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) তাঁর যুগে হাফিজে হাদীসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ছিলেন।

হাদীস সংগ্রহ ও বর্ণনায় হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র ব্যুৎপত্তি ও বৈশিষ্ট্য

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) নিজেকে একনিষ্ঠভাবে রসূলে আকরাম (সা)-এর খিদমতে নিয়োজিত রাখেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাহচর্যে থেকে হাদীসের জ্ঞান সঞ্চয় করেন। তাঁর জ্ঞানপিপাসা ছিল অত্যধিক। তিনি প্রায়শই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকটে নতুন নতুন সওয়াল করতেন এবং উত্তর সংগ্রহ করতেন। সাধারণত এ কারণেই তিনি বহু সংখ্যক হাদীস সংগ্রহে সমর্থ হন। হাদীস সংগ্রহে যেমন তাঁর বিরামহীন চেষ্টা সফল ও সার্থক হয়, হাদীসের প্রচারেও তাঁর প্রচেষ্টা আশাতীত সফলতা অর্জন করে। কুরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াত তাঁকে ইল্‌ম প্রচারে উৎসাহিত করে। আয়াতটির অর্থ হচ্ছে এই-"আমি যে সব নির্দেশ নাযিল করেছি, কিতাবে সে সবের স্পষ্টত বর্ণনা দেওয়ার পরও যারা ঐ সব গোপন করে, তারাই ঐ সব লোক, যাদের আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত দেন এবং সকল লা'নতকারীও ওদেরকে লা'নত দিয়ে থাকেন।"

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, "আয়াত শরীফের তাকীদের কারণেই আমি হাদীস রিওয়ায়েত করে থাকি, নইলে আমি আদৌ কোন হাদীস বর্ণনা করতাম না। জ্ঞান চর্চার জন্যে যে অনুকূল পরিবেশের দরকার, তিনি সেরূপ পরিবেশ পুরোপুরিই অর্জন করেছিলেন, যা সাধারণত অনেকেরই নসীব হয় না।"

তিনি বলেন ঃ "কোন কোন লোক বলে থাকেন আবূ হুরায়রা (রা) অধিক হাদীস বর্ণনা করেন। প্রকৃত কারণ এই যে, আমার মুহাজির ভাইগণ হাটে-বাজারে গমন করতেন, নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য সাংসারিক কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতেন। আনসারগণ ছিলেন ভূস্বামী। তাঁরা নিজেদের জায়গা-জমি, ক্ষেত-খামার ইত্যাদির ব্যাপারে মশগুল থাকতেন। আমি ছিলাম এ সব ঝামেলামুক্ত। সর্বক্ষণ হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে নিজেকে নিয়োজিত রাখতাম। সে সময় তাঁরা উপস্থিত থাকতেন না-যা তাঁরা ভুলে যেতেন, আমি তা স্মরণ রাখতাম।"

হযরত আবূ আকের (রা) বর্ণনা করেন ঃ আমি একবার হযরত তাল্‌হা (রা)-র খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো ঃ হে আবূ মুহাম্মদ তাল্‌হা! বুঝি না, এ ইয়েমেনী লোকটি (আবূ হুরায়রা) কেমন করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আপনাদের চাইতে বেশি জানেন? হযরত তাল্‌হা (রা) বলেন ঃ এতে সন্দেহের

অবকাশ নেই যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা) হতে এমন হাদীসও শুনেছেন, যা আমরা শুনি নি। এরূপ অনেক বিষয়ও তিনি জ্ঞাত আছেন, যা আমরা জ্ঞাত নই। কারণ আমাদের ঘর-বাড়ি, ছেলে-পুলে ও সয়-সম্পত্তি ছিল। আমরা সাংসারিক কাজকর্মে লিপ্ত থাকতাম, সকাল-বিকাল অবকাশের সময় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হতাম। কিছুক্ষণ পর আবার ঘরে ফিরে আসতাম। আর আবূ হুরায়রা (রা) ছিলেন দরিদ্র। এসব ঝামেলা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঁর হাত ছিল হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পবিত্র হাতে। রসূলুল্লাহ্ (সা) যেখানে তশরীফ নিয়ে যেতেন, আবূ হুরায়রা (রা) সেখানে তাঁর সাথে যেতেন। তাই আমাদের অজানা অনেক হাদীস তাঁর জানা আছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের মধ্য হতে কেউ কখনও তাঁর সম্পর্কে এ অভিযোগ উত্থাপন করেন নি যে, তিনি এমন কোন হাদীস বর্ণনা করেছেন যা রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন নি।

একবার হযরত আবূ হুরায়রা (রা) একটি হাদীস বর্ণনা করছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) সে পথ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, "আবূ হুরায়রা! ভেবে দেখ। রসূলুল্লাহ্ (সা) এরূপ ইরশাদ করেছেন কিনা।" তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে সাথে করে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা)-র নিকট উপস্থিত হলেন এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি তিনি শুনেছেন কিনা জিজ্ঞেস করলেন। হযরত আয়েশা (রা) বললেন, "হ্যাঁ আমি হাদীসটি হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছ থেকে শুনেছি।" তখন হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, "আমাকে রসূলুলাহ্ (সা)-র খিদমত থেকে দুনিয়ার কোন সম্পর্কই দূরে রাখতে পারতো না। আমি রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে দু'টি জিনিসই সওয়াল করতাম ঃ কোন বাণী যা তিনি আমাকে শিক্ষা দিতেন। এবং কোন আহার্য যা তিনি আমাকে আহার করতে দিতেন।" হযরত ইবনে উমর (রা) হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র বৈশিষ্ট্য স্বীকার করে নিয়ে বললেন ঃ সত্যিই আপনি আমাদের মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অধিক সঙ্গ লাভকারী ও অধিক হাদীস সংগ্রহকারী, এতে কোন সন্দেহ নেই।

একবার কোন কারণে মদীনার শাসনকর্তা মারওয়ান হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র উপর অসন্তুষ্ট হন।

রাগান্বিত হয়ে তিনি বললেন, "লোকেরা বলে যে, আবূ হুরায়রা অধিক হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। অথচ তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওফাতের কিছুকাল পূর্বে মদীনায় আগমন করেন।" হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, "আমি যখন মদীনা শরীফ আসি, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা) তখন খায়বরে ছিলেন। আমি সে সময় হতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওফাত পর্যন্ত সর্বদা তাঁর সান্নিধ্যে থাকতাম, তাঁর খিদমতে আত্মনিয়োগ করতাম। এমনকি প্রয়োজনবোধে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সঙ্গে উম্মুল মু'মিনীনের ঘরেও

যেতাম, পবিত্র হজ্জ যাপনের সময়ও সফরে তাঁর সাথে ছিলাম। এসব কারণেই আমি অধিক সংখ্যক হাদীস জ্ঞাত হই! যাঁরা আমার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, আল্লাহ্র কসম তাঁরাও আমার এ বৈশিষ্ট্যের কথা স্বীকার করেন এবং আমার হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে থাকেন। তাঁদের মধ্যে হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত যুবায়র (রা), হযরত তালহা (রা) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা) সেই ভাগ্যবান সাহাবী, যাঁর গৃহে রসূলে আকরাম (সা) হিজরত করে মদীনা পৌছার পর সর্বপ্রথম অবস্থান করেছিলেন। তিনি স্বয়ং হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র নিকট হাদীস জিজ্ঞেস করতেন এবং তার কারণ ব্যাখ্যাস্বরূপ তিনি বলতেন ঃ আমি নিজের স্মরণ শক্তির উপর নির্ভর করতে পারি না যতটুকু নির্ভর করতে পারি আবূ হুরায়রার স্মরণ শক্তির উপর। তিনি বলেন ঃ আমি নিজে হাদীস বর্ণনা করার চেয়ে হযরত আবূ হুরায়রা হতে হাদীস বর্ণনা করাকে অধিক পছন্দ করি।

উপরোল্লিখিত ঘটনাবলী হতে এ কথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, প্রায় সাহাবীই হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র প্রতি আস্থাশীল ছিলেন এবং তিনি মুসলমান হওয়ার পর থেকে সর্বদা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সান্নিধ্যে থেকেছেন আর তাঁর অসাধারণ স্মরণশক্তির বৈশিষ্ট্যের ব্যাপার সবাই স্বীকার করতেন। তাঁর অধিক হাদীস বর্ণনার কারণে কারো মনে কোন সন্দেহ বা বিস্ময়ের উদ্রেক হলেও স্বয়ং তিনি বা অন্য কোন সাহাবী কর্তৃক তাঁর কারণ বিশ্লেষণের পর তাঁদের সন্দেহ বা বিস্ময়ের নিরসন হয়ে যেতো।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪টি। তন্মধ্যে হযরত বুখারী (র) ও হযরত মুসলিম (র) যুক্তভাবে রিওয়ায়েত করেছেন ৩২৫টি, আর পৃথকভাবে হযরত বুখারী (র) ও হযরত মুসলিম (র) রিওয়ায়েত করেছেন যথাক্রমে ৭৯ ও ৯৩টি। অসাধারণ স্মরণশক্তি, হাদীস প্রচারে ঐকান্তিক চেষ্টা, সাংসারিক ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকা, চার বছরকাল সর্বাবস্থায় হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতের সৌভাগ্য লাভ --হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র এসব বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য করলে উপরোল্লিখিত হাদীসের সংখ্যাকে অত্যধিক বা অনির্ভরযোগ্য বলা চলে না। সাহাবায়ে কিরাম (রা) রসূলে আকরাম (সা)-এর এমন কোন বাণীর হেরফের করার দুঃসাহস করতে পারেন না, যা হুযূর (সা) ইরশাদ করেন নি। হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রের মতো, যাঁকেই তোমরা অনুসরণ করো হিদায়ত প্রাপ্ত হবে।

একজন আইনজ্ঞের স্মৃতিপটে আইন এবং মুকদ্দমার ফয়সালার কত নযীরই না মজুদ থাকে! ডাক্তারের স্মৃতিপটে কত প্রকার ওষুধের নাম ও গুণাগুণ অঙ্কিত থাকে! হাফিজ–এ কুরআনের স্মৃতিশক্তিতেও কুরআনের সকল আয়াত অঙ্কিত থাকে! হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ৫৩৭৪টি হাদীস রিওয়ায়েত করলে এতে বিস্ময়ের কি আছে !

হাদীস শুধুমাত্র হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা)–র বাণীতে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি যা বলেছেন, তা–ও হাদীস। তিনি যা করেছেন নবী হিসাবে, তা–ও হাদীস। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ আমি যে কোন অবস্থায় যা বলে থাকি, তা সত্যই বলে থাকি। তোমরা আমার বাণী লিপিবদ্ধ করতে পার।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসের সংখ্যার আধিক্যের প্রতি লক্ষ্য করে তা কিছুতেই গ্রহণ করা যেতে পারে না বলে কোন কোন মহলের মন্তব্য আমরা মেনে নিতে পারি না। তিনি বলেছেন ঃ "আমার নিকট এরূপ হাদীস ও কতকগুলো বিষয় জানা আছে, যা সাধারণ্যে প্রকাশের অনুপযোগী। যদি আমি ওসব প্রকাশ করি, তাহলে আমার গলা কেটে ফেলা হবে।"

কোন সাহাবীর সমালোচনায় নিজেকে লিপ্ত করা উচিত নয়। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের উপর রাযী ও সন্তুষ্ট হয়েছেন। কুরআনে এ সন্তুষ্টির স্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে।

আল্লাহ্-ভীতি ও মহব্বতে রসূল (সা)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) প্রায়ই আল্লাহ্র ভয়ে কম্পমান থাকতেন। সুকাইয়া আচবাহী বর্ণনা করেন ঃ আমি একবার মদীনা শরীফে আগমন করলাম। এক ব্যক্তির পার্শ্বে অনেক লোকের ভিড় দেখলাম। আমি লোকজনের নিকট তাঁর পরিচয় জানতে চাইলাম। তাঁরা বললেন ঃ এ ব্যক্তি হলেন আবূ হুরায়রা। আমি আদব সহকারে তাঁর সম্মুখে বসে পড়লাম। সে সময় তিনি লোকদের নিকট হাদীস বর্ণনা করছিলেন। হাদীস বর্ণনার'পর যখন লোকজন নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে প্রস্থান করলেন, তখন আমি তাঁর খিদমতে অনুনয় করলাম, "আপনি আমাকে আল্লাহ্র রসূলের এরূপ একটি বাণী শোনান যা আপনি নিজ কানে শুনেছেন, জ্ঞাত হয়েছেন এবং বুঝেছেন।" উত্তরে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বললেন ঃ আমি তোমার নিকট অনুরূপ হাদীসই বর্ণনা করব। এ কথা বলার পরই তিনি বেহুঁশ হয়ে মুষড়ে পড়লেন, আবার নিজেকে সামলিয়ে নিলেন। পুনরায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। তৃতীয় বারের পর তিনি বললেন ঃ আমি তোমাকে এরূপ হাদীসই শোনাব, যা হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা) এ ঘরেই আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তখন আমি ব্যতীত অন্য কোন লোক এ ঘরে ছিল না।

এ কথা বলার পর তিনি পুনরায় বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। হুঁশ ফিরে এলে পরে তিনি বললেন ঃ হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ স্বয়ং বান্দাদের বিচারক হবেন। তিন ব্যক্তিকে তাঁর এজলাসে হাযির করানো হবে, অতঃপর সওয়াল জবাব আরম্ভ হবে। সে তিন ব্যক্তি হলেন ঃ

১. কুরআনের ক্বারী ২. মালদার ৩. শহীদ।

আল্লাহ্ তা'আলা ক্বারীকে প্রশ্ন করবেন ঃ আমি তোমাকে কুরআন পড়ার তৌফিক দিইনি?

ক্বারী ঃ হ্যাঁ, হে প্রভু! নিশ্চয়ই তৌফিক দিয়েছেন।

আল্লাহ্ ঃ তুমি কি আমল করেছ?

ক্বারী ঃ আমি দিবারাত্রি কুরআন পড়েছি, প্রভু।

আল্লাহ্ ঃ তুমি মিথ্যা বলেছ, তুমি প্রশংসা কুড়ানোর উদ্দেশ্যে কুরআন পড়েছ, লোকে যেন তোমাকে ক্বারী বলে। তোমার উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে, যথেষ্ট প্রশংসা তুমি কুড়িয়েছ।

অতপর মালদারকে ডেকে আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেন ঃ

আমি তোমাকে প্রচুর ধনসম্পদ দান করেছিলাম। তোমাকে কারো মুখাপেক্ষী রাখিনি। তুমি এর হক কি শোধ করেছ?

মালদার ব্যক্তি ঃ হে প্রভু! আমি তোমার প্রদত্ত ধনসম্পদ তোমারই পথে অকাতরে ব্যয় করেছি। আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করেছি।

আল্লাহ্ ঃ তুমি মিথ্যে বলছ, তুমি লোকের প্রশংসাভাজন হওয়ার জন্যে ধনসম্পদ ব্যয় করেছ। তোমার সে উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে।

অতপর শহীদকে আল্লাহ্‌র সমীপে পেশ করা হবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে।

আল্লাহ্ ঃ তুমি কেন প্রাণ দিয়েছ?

শহীদ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমারই উদ্দেশে কাফিরদের সাথে জিহাদ করে শাহাদাত বরণ করেছি।

আল্লাহ্ ঃ তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি বীর মুজাহিদ খ্যাতি ও উপাধি লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করেছ, প্রাণ দিয়েছ, তুমি জগতে বীর ইপাধি লাভ করেছ এবং খ্যাত হয়েছ, লোকের প্রশংসাভাজন হয়েছ, তুমি যা চেয়েছিলে, তা পেয়েছ।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বললেন ঃ এ পর্যন্ত বর্ণনার পর রসূলে আকরাম (সা) আমার হাঁটুর উপর হাত রেখে ইরশাদ করেছেন ঃ

আবূ হুরায়রা! এরূপ তিন ব্যক্তির দ্বারাই সর্বপ্রথম দোযখের অগ্নি প্রজ্বলিত করা হবে।

একবার হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র দস্তরখানায় কয়েকটি চাপাতি রুটি দৃষ্ট হলো। তিনি চাপাতি রুটির দিকে দৃষ্টি নিবেদন করে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলেন, অতপর বলতে লাগলেন ঃ আল্লাহ্! আল্লাহ্! হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সারাটি জীবন এরূপভাবে কেটেছে যে, তিনি চাপাতি রুটি কোন সময় দেখেন নি!

হযরত রসূলে আকরাম (সা)-এর বংশের প্রতি হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র মহব্বত

হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বংশধর আহলে বায়ত-এর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও মহব্বত প্রদর্শন ঈমানেরই অংশ। তাঁদের হকের প্রতি নযর রাখার জন্যে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকীদ জানিয়েছেন উম্মতের সকলকে। নবী-দৌহিত্র সায়্যেদুনা হযরত হাসান (রা) ও হযরত হুসায়ন (রা)-কে সাহাবায়ে কিরাম অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

একবার হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সাইয়েদুনা হাসান (রা)-এর নিকট গিয়ে বললেন ঃ আপনার পিঠের উপরের অংশে যে স্থানটুকু হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা) চুম্বন করেছিলেন, আমার বাসনা যে, আমি সে স্থানটুকু চুম্বন করি। দয়া করে আপনি উক্ত স্থান থেকে কাপড় সরিয়ে নিন, যেন চুম্বন করতে পারি। হযরত হাসান (রা) তাঁর বাসনা পূর্ণ করতে অনুমতি প্রদান করলেন। সাইয়েদুনা হযরত হাসান (রা) ইন্তিকাল করলে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন ঃ হে লোক সকল! হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মাহবুব (প্রিয়তম) আজ দুনিয়া ত্যাগ করলেন। সুতরাং তোমরা ইচ্ছা মতো কেঁদে নাও।

সত্য প্রকাশের দৃঢ়তা

সত্যনিষ্ঠ থাকা ও হক কথা প্রকাশ করা মানুষের একটি মহৎ স্বভাব। এদিক থেকে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) তাঁর নীতির প্রতি এত অবিচল ছিলেন যে, যেরূপ ক্ষমতাশালীই হোক না কেন কারো ভুল চোখে পড়লে তিনি তার প্রতি নিঃসঙ্কোচে অঙ্গুলি নির্দেশ করতেন।

তাঁর মদীনা অবস্থান করার সময়ে মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন মারওয়ান। তখন অধিকাংশ সময়ই হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র সাথে মারওয়ানের যোগাযোগ ছিল। এক সময় তিনি তাঁর বাসভবনে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, ঘরের দেয়ালে চিত্র টাঙ্গানো। চিত্র দেখে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বললেন ঃ আমি হযরত (সা)-কে

সীমালঙ্ঘনকারী আর কে আছে, যে আমার সৃষ্ট জীবের অনুরূপ তৈরী করে। এ রকম সৃষ্টি করতে পারবে বলে যদি কেউ দাবি করে, তাহলে তার উচিত সে যেন (ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র) একটি বিন্দু কিংবা একটি যব অথবা অন্য যে কোন প্রকারের শস্য তৈরী করে দেখায়।" বর্ণিত আছে যে, একবার জনৈকা মহিলার সাথে সাক্ষাতকারের সময় মহিলাটির জামা থেকে সুঘ্রাণ বের হচ্ছিল। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কি মসজিদ থেকে আসছেন? হ্যাঁ, উত্তরে মহিলাটি বললেন। আবার প্রশ্ন করলেন ঃ শুধু কি মসজিদে যাবার উদ্দেশ্যেই সুগন্ধি ব্যবহার করেছিলেন? এর জবাবে মহিলা হ্যাঁসূচক মন্তব্য করলেন। তখন হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বললেন ঃ আমি হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, কোন মহিলা যদি মসজিদে যাবার উদ্দেশ্যেও সুগন্ধি ব্যবহার করেন, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত সে তা ধুয়েমুছে না ফেলে ততক্ষণ পর্যন্ত তার নামায কবূল হবে না। কারণ এটা ক্রমে ফিত্‌নার রূপ পরিগ্রহ করে।

শিষ্য ও হাদীস বর্ণনাকারীদের সংখ্যা

হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র শাগরিদের সংখ্যা প্রায় আট শতাধিক। যাঁরা তাঁর কাছ থেকে শুনে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা), হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা), হযরত উবাহ ইবনে কা'ব (রা), হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা), হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়র (রা), হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা), হযরত উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) প্রমুখ প্রধান সাহাবার নাম উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য সাহাবা ও তাবেয়ীনদের মধ্যে রয়েছেন আবূ রাফে, ওয়াসিলা, জাবির, মারওয়ান, ইবনে হাকাম, কুরাইসা ইবনে যুবায়র, সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার, কায়স ইবনে আবি হাশিম, মালিক ইবনে আবি আমির, আবূ উসামা ইবনে সাহাল ইবনে হানিফ, আবূ ইদরীস খাওলানী, আবূ উসমান নাহদী, আবূ রাফে সায়েগ, আবূ যারআ ইবনে আমর, আবূ মুসলিম ইবনে ফারেস, বুসর ইবনে সাঈদ, বশীর ইবনে নুহাইক, বাজা জুহানী, রাবিত ইবনে আয়াজ, হাফস ইবনে আসিম ইবনে উমর ইবনে খাত্তাব, হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আউফ, হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান হিমায়ারী, জানযালা ইবনে আলী আসলামী, খাব্বাব খাল্লাস ইবনে আমর, হাকাম ইবনে মীনা, খালিদ ইবনে গাল্লাক, আবূ বাইস যিয়াদ ইবনে রাবাহ, সালেম ইবনে আবদুল্লাহ, সালিম আবুল গাইস, সালেম, সাঈদ ইবনে আবূ

সাঈদ, আবু সাঈদ মাকবুরী, হাসান বসরী, মুহাম্মদ বিন সীরিন, সাঈদ ইবনে আমর ইবনে সাঈদ ইবনুল আস, সুলায়মান ইবনে যাসার, আবুল হুবাব, সাঈদ ইবনে যাসার, সিনান ইবনে আবূ সিনান, আমের ইবনে সাদ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস, শুরাই ইবনে হানী, আউস, ইকরামা, মুজাহিদ, আতা, আমের শাবী, আবদুল্লাহ্ ইবনে রাবা আনসারী, আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক, আবদুল্লাহ্ ইবনে সালিবা, আবুল ওয়ালিদ, আবদুল্লাহ্ ইবনে হারিস, সাঈদ ইবনে সামআন, সাঈদ ইবনে মারজানা, আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান, আবদুর রহমান ইবনে সা'দ, আবদুর রহমান আবি আমর আনসারী, আবদুর রহমান ইবনে ইয়াকুব, আবদুর রহমান আবূ নাঈম বাজলী, আবদুর রহমান ইবনে মেহরান, আ'রজ, ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্, ওবায়দুল্লাহ ইবনে সুফিয়ান হাযরামী, আতা ইবনে মিয়না, আতা ইবনে ইয়াযিদ লাইসী, আবূ সাঈদ মাওলা ইবনে কুবাইজ, আজলান ইবনে মাওলা ফাতেমা, ইরাব ইবনে মালেক, ওবাইদ হুনাইন, ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবী রাফে, আতা ইবনে ইয়াসার, আমর ইবনে আবূ সুফিয়ান, আম্বাসা ইবনে সাঈদ ইবনুল আ'স, মুহম্মদ ইবনে কাইস ইবনে মাখরামা, মূসা ইবনে তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ্, ওরওয়া ইবনুয যুবায়র, মুহাম্মদ ইবনে আব্বাস, জাফর মুহম্মদ ইবনে আবি আয়েশা, মুহাম্মদ ইবনে যিয়াদ জুমায়ী, মুহম্মদ ইবনে আবদুর রহমান, মূসা ইবনে বাসার, না'ফে ইবনে যুবায়র ইবনে মুতইম, না'ফে মাওলা ইবনে উমর, না'ফে মাওলা আবী কাতাদা, ইউসুফ ইবনে মাহেক, হায়সাম ইবনে আবী সিনান, ইয়াযিদ ইবনে হুরমুজ, আবূ হাযেমূল আশজঈ, আবূ বকর ইবনে আবদুর রহমান, আবূ তামিমা হুযায়মী, ইয়াযিদ ইবনে আসম, মূসা ইবনে ওয়াবদান, আবুস শা'সাআলা মুহারিবী, আবূ সালেহ সাম্মান, আবূ সাতকান, ইবনে তরীফ আলমুরী। জ্ঞানের দিক দিয়ে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) অন্য সাহাবীদের মধ্যে খুবই গণ্যমান্য ছিলেন। মাতৃভাষা আরবী ছাড়াও ফার্সী ভাষার উপর তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল।

রাজনৈতিক জীবন

প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা)–এর সময়ে তিনি কোন রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অংশগ্রহণ করেন নি। এজন্য প্রথম খলীফার খিলাফতকালে রাজনীতিতে তাঁর কোন উল্লেখযোগ্য তৎপরতা নেই। এ সময়ে তিনি হাদীস প্রচারে নীরবভাবে সময় অতিবাহিত করেন।

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা)–এর খিলাফতকাল থেকেই শুরু হয় তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়। খলীফা তাঁকে বাহ্‌রাইনের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। সেদিন থেকেই তাঁর অভাব-অনটনের সমাপ্তি ঘটে। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত

থাকাকালেও তাঁর সাদাসিধে চাল-চলনে কোনই পরিবর্তন আসেনি। তিনি একটি গাধার পিঠে চড়ে নগর পরিভ্রমণ করতেন।

সাধারণ মোটা কাপড় দ্বারা তৈরী আসনে তিনি বসতেন। গাধাটির লাগাম ছিল গাছের ছাল দ্বারা তৈরী। এত সাধারণভাবে তিনি বেরুতেন যে, কেউ জানতই না। কারো সামনে যদি পড়ে যেতেন ঠাট্টাচ্ছলে নিজেই বলতেন ঃ পথ ছাড়ো, শাসনকর্তা আসছেন। বাহ্‌রাইন থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় দশ হাজার দিরহাম তাঁর হাতে ছিল। এ বিষয়ে তিনি হযরত উমর (রা)-এর সব কঠোর জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হলেন! উত্তরে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বললেন যে, ঘোড়ার বাচ্চা দাস ট্যাক্স থেকে এ টাকা আহরিত। অনুসন্ধান করে এর সত্যতা প্রমাণিত হল। হযরত উমর (রা) দ্বিতীয়বার তাঁকে বাহ্‌রাইনের শাসনকর্তার পদে নিয়োগ করতে চাইলে তিনি সরাসরি সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন। হযরত উমর (রা) বললেন ঃ শাসনকর্তার পদ গ্রহণে তোমার অসম্মতিটা কোন্‌খানে? এর আকাঙ্ক্ষা তো হযরত ইউসুফ (আ)ও করেছিলেন, যিনি তোমার থেকেও শ্রেষ্ঠ।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, মিসরের কারাগারে হযরত ইউসুফ (আ)-এর বন্দী থাকার সময় ফিরাউন যে স্বপ্ন দেখেছিল, তৎকালীন মিসরের সমস্ত জ্ঞানী-গুণী একত্র হয়েও তার ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হলেন না। অবশেষে হযরত ইউসুফ (আ)-কেই তার ব্যাখ্যা করে দিতে হয়। তিনি বললেন ঃ আগামী সাত বছর দেশে প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপন্ন হবে এবং তা প্রচুর পরিমাণে উদ্বৃত্ত থেকে যাবে। কিন্তু পরবর্তী সাত বছর হবে দেশের জন্যে মহা দুর্ভিক্ষের দিন। তাই পূর্ববর্তী সাত বছরের উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য দ্বারা পরবর্তী সাত বছরের আকাল থেকে রক্ষা পাবার চেষ্টা করতে হবে। ফিরাউনের সাথে হযরত ইউসুফ (আ)-এর আলাপ-আলোচনার পর যখন ফিরাউন তাঁর অনন্যসাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেল, তখন ফিরাউন হযরত ইউসুফ (আ)-এর কাছ থেকে এ মহাসংকটের মুকাবিলার জন্যে পরামর্শ কামনা করল। হযরত ইউসুফ (আ) উত্তরে ফিরাউনকে প্রতিকার নির্দেশ করলেন যে, রাষ্ট্রে খাদ্যশস্যের ভার আপনি সম্পূর্ণ আমার উপরই অর্পণ করুন এবং অনাগত দিনের মহাসংকটের মুকাবিলায় প্রয়োজনীয় ক্ষমতা আমারই হস্তে ন্যস্ত করুন, যথাযথ যোগ্যতার সাথে আমি এ দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারব।

হযরত উমর (রা)-এর কথার জবাবে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বললেন ঃ উমর, উনি ছিলেন নবী আর নবীজাদা। আমি বেচারা উমাইমার ছেলে আবূ হুরায়রা ; তাঁর সাথে আমার তুলনা হয় কি করে? আমি তিনটি জিনিসকে ভয় করি। প্রথমত, আমার অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে যখন কিছু বলি। দ্বিতীয়ত, যদি শরীয়তের বরখেলাফ কোন

ফায়সালা আমি করি। তৃতীয়ত, আমি যদি কোন কারণে অপমানিত হই অথবা আমার মালপত্র লুণ্ঠিত হয় অথবা আমি নিহত হই।

তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা)–এর খিলাফতকালে তাঁর কোন রাজনৈতিক তৎপরতা ছিল না, অবশ্য তাঁর খিলাফতের শেষকালে নিজে গৃহে অন্তরীণ থাকার সময় তিনি খলীফাকে সাহায্য ও সমর্থন দানের জন্যে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতেন। খলীফা তাঁর স্বগৃহে অন্তরীণ থাকার সময় তিনি নিজেও খলীফার গৃহে অন্যান্য লোকের সাথে ছিলেন। তিনি জনসাধারণকে সম্বোধন করে বললেন ঃ আমি হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা)–কে বলতে শুনেছি তোমরা আমার পরে ঝগড়া–বিবাদে লিপ্ত হবে। লোকেরা জানতে চাইল ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ! ওই সময় আমাদের কি কর্মপন্থা হওয়া উচিত ? আল্লাহ্র রসূল (সা) তাঁর উত্তরে বললেন ঃ তোমাদের 'আমীন' (সত্যবাদী) এবং তাঁর সমর্থকদের সাথে থাকা চাই।

এখানে 'আমীন' অর্থ স্পষ্টতই হযরত উসমান (রা)–এর প্রতি ইঙ্গিত ছিল।

হযরত উসমান (রা)–এর অবরোধের সময় পর্যন্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সম্পর্কে জানা যায়। এরপর হযরত উসমান (রা)–এর শাহাদত, জামাল ও সিফফীন যুদ্ধ ইত্যাদিতে তাঁর কোন ভূমিকা কোথাও লক্ষ্য করা যায় না, কারণ এই বিবাদের সময় নেতৃস্থানীয় প্রায় সাহাবীই সতর্কতাস্বরূপ নির্জনবাস গ্রহণ করেছিলেন, অনেকে অনাবাদী এলাকায় তাঁদের অধিবাস শুরু করেছিলেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা)ও এই ফিত্নায় জড়িত থাকার ভয়ে কোথাও আত্মগোপন করেছিলেন।

ইবাদত

'ইবাদত গুজারিতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)–র বিশেষ নিষ্ঠা ছিল। নিজে রাত্রি জাগতেন এবং পরিবার–পরিজনকেও রাত্রি জাগরণে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনজন সদস্য সমবায়ে গঠিত তাঁর পরিবার পালাক্রমে সারারাত জেগে ইবাদত করতেন। এক–তৃতীয়াংশ রাত ইবাদত করে একজন আরেকজনকে জাগিয়ে দিতেন। এমনভাবে দ্বিতীয় ব্যক্তি কর্তৃক দ্বিতীয় তৃতীয়াংশ রাত 'ইবাদত গুজারিতে কাটানোর পর শেষ তৃতীয়াংশে 'ইবাদত করার জন্য তৃতীয়জনকে ডেকে দিতেন। তাঁর পরিবারের উল্লিখিত তিনজন সদস্য ছিলেন তিনি, তাঁর স্ত্রী এবং ভৃত্য।

হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আবুদ্ দারদা (রা) এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রা)–কে ইশ্রাকের নামায পড়ার জন্য অসিয়ত করেছিলেন। তাই জীবনে তাঁরা কখনো ইশ্রাকের নামায পড়ায় অবহেলা করেন নি।

প্রতি মাসের শুরুতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) তিনটি রোযা নিয়মিতভাবে রাখতেন। যদি কোনবার ম..সের প্রথমে রোযা রাখতে না পারতেন তাহলে মাসের শেষ দিকে নিশ্চয়ই তা পূরণ করে নিতেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) দৈনিক বার হাজার তস্‌বীহ নিয়মিতভাবে পড়তেন। জিজ্ঞাসিত হলে বলতেন ঃ আমার পাপের সমান তস্‌বীহ আদায় করছি। একটি থলের মধ্যে কংকর এবং বীচি ভর্তি থাকত। থলে খালি হয়ে গেলে ভৃত্যকে পুনঃ থলে ভরে দেবার জন্য আদেশ দেয়া হতো। ভৃত্য থলে ভর্তি করে এনে দিলে আবার তিনি তসবীহ্ পড়তেন!

হযরত আবূ হুরায়রা (রা)–র নাতি হযরত নঈম বলেছেন, "আমার দাদার কাছে একটি ডোরা থাকত, তাতে দু'হাজার গিট দেওয়া থাকত। রাতে সেই দু'হাজার গিটের তস্‌বীহ্ না পড়া পর্যন্ত তিনি ঘুমুতে যেতেন না।"

আতিথেয়তা

অভাব ও প্রাচুর্যের উভয় অবস্থায়ই তিনি আতিথেয়তায় উদার অন্তঃকরণের পরিচয় দিয়েছেন। আতিথেয়তা সাহাবীদের সাধারণ ও স্বাভাবিক গুণ্য হলেও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সম্পর্কে এ ধারণা বর্তমান ছিল যে, তাঁর মত অতিথিপরায়ণ ব্যক্তি খুবই কম ছিলেন।

তাফাভী বলেছেন, "আমি হযরত আবূ হুরায়রা (রা)–র কাছে ছয় মাস ছিলাম। আমি তাঁর মত কাউকেও অতিথিপরায়ণ এবং অতিথিদের প্রতি অত যত্নবান দেখিনি।"

প্রসঙ্গত আরেকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। কয়েকজন সদস্য সম্বলিত এক প্রতিনিধি দল একবার হযরত আমির মু'আবিয়া (রা)–র সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে গমন করেন। প্রতিনিধিদলে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)–ও ছিলেন। তখন ছিল রমযান মাস। সদস্যদের নিয়ম ছিল খাবার সময় একে অপরকে দাওয়াত করার। এখানেও হযরত আবূ হুরায়রা (রা)–ই সবচেয়ে বেশি দাওয়াত করেছিলেন।

অসুস্থতা

হিজরী ৫৭ সালে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) মদীনায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তাঁকে দেখতে আসতেন। মারওয়ান ইব্‌নে হাকামও তাঁকে দেখার জন্য আসতেন। অসুস্থ থাকাকালীন সময়ে পরকালের চিন্তা করে তিনি খুবই কান্নাকাটি করতেন। তাঁর কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে বলতেন ঃ আমার এ কান্না মায়াময় পৃথিবী ছেড়ে যাবার দুঃখে নয় বরং সফরের দীর্ঘতা এবং সম্বলহীন অবস্থার জন্যেই আমি কাঁদছি। বেশ্‌ত ও দোযখের মধ্যবর্তী স্থানে বর্তমান মুহূর্তে আমার অবস্থিতি। আমি জানি না, এখান হতে আমাকে কোথায় যেতে হবে।

একবার হযরত আবূ সালমা (রা) তাঁকে দেখতে এসে তাঁর রোগমুক্তির জন্য মুনাজাত করেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) তা শুনে বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ্!

আমাকে পৃথিবীতে আর ফিরিয়ে দিও না। তারপর হযরত আবূ সালমা (রা)-কে সম্বোধন করে বললেন ঃ ওহে আবূ সালমা! সেদিন খুবই নিকটবর্তী, যেদিন মানুষ মৃত্যুকে স্বর্ণভান্ডারের চাইতেও মূল্যবান বলে মনে করবে। তখনো পর্যন্ত যদি তুমি জীবিত থাক, তাহলে দেখবে যে, মানুষ কোন কবরের নিকট দিয়ে যাবার সময় বলবে ঃ আফসোস, কবরটিতে যদি আমারই স্থান হত!

ইনতিকাল

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) অসিয়ত করে যান ঃ আরবের প্রাচীন প্রথামত আমার কবরের উপর যেন কোন তাঁবু টাঙ্গানো না হয় এবং আমার জানাযার পিছে যেন আগুন নিয়ে না যাওয়া হয়। আমার দাফন-কাফন যেন তাড়াতাড়ি সমাপন করা হয়। কারণ আমি যদি পুণ্যাধিকারী হই তাহলে অনতিবিলম্বেই আমার প্রেমময় প্রভুর সঙ্গলাভে সক্ষম হব এবং পাপী হলে অতি সত্বরই তোমাদের কাঁধের উপর থেকে একজন পাপীর বোঝা হালকা হয়ে যাবে।

এই অসিয়তের অল্পক্ষণ পরেই তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর বয়স ৭৮ বছর। তাঁর ইন্তিকালের কথা শুনে হযরত ওলীদ ইবনে ওৎবা সংবাদ পাঠালেন, তাঁর অনুমতি ছাড়া যেন মৃতদেহ দাফন করা না হয়। তাই যোহর থেকে আসর পর্যন্ত তাঁর জন্যে অপেক্ষা করা হয়েছিল কিন্তু তবুও হযরত ওলীদ না আসায় জনসাধারণ জানাযার নামায পড়তে চাইলে হযরত ওলীদের প্রতিনিধি এই বলে তাদের নিরস্ত করেন যে, হযরত ওলীদের অনুপস্থিতিতে জানাযার নামায আদায় সম্ভব নয়। সুতরাং আসরের নামাযের পর হযরত ওলীদের ইমামতিতে জানাযার নামায আদায় হয়। জানাযার নামাযে যারা শরীক হন তাঁদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) এবং হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জানাযার নামাযের পর হযরত উসমান (রা)-এর সন্তানেরা তাঁর পবিত্র লাশ কাঁধে করে জান্নাতুল বাকীতে নিয়ে যান এবং ওখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

ওফাত কালে তিনি কি পরিমাণ বিষয়-সম্পত্তি রেখে গেছেন, তা জানা যায় না। তবে তাঁর ওফাতের সংবাদ হযরত আমীর মু'আবিয়া (রা)-কে জানান হলে তিনি হযরত ওলীদকে তাঁর সন্তানদেরকে রাজকোষ থেকে দশ হাজার দিরহাম প্রদানের ব্যবস্থা করেন এবং সন্তানের [illegible] নির্দেশ দেন।